গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

শিরোনাম

নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ : সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে

পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক: শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস

তত্ত্বাবধায়ক: অধ্যাপিকা গোপা দত্ত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

২০২১

ভূমিকা

সমাজ থেকে রসদ সংগ্রহ করে সাহিত্যিক সৃজন করেন তাঁর সাহিত্য । সেকারণেই সাহিত্যে সমাজের বিভিন্ন অংশকে দেখতে পাওয়া যায় । সমাজেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শিক্ষা। কারণ, শিক্ষার মানের উপর নির্ভর করে দেশের সংস্কৃতির মান, চিন্তার মান , বুদ্ধির মান । জীবনকে ও সমাজকে সুন্দর ও বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রকৃতির নিয়মকে জেনে তাকে পরিবর্তন করার যে সংগ্রাম মানুষকে করতে হয়েছে বা হচ্ছে তাই শিক্ষা। অর্থাৎ, মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার আদর্শ এবং লক্ষ্য । এই আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পাঠ্যবিষয় , পঠনক্রিয়া , শিক্ষার্থী , পরিচালন সমিতি সমন্বিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সমাজের । অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী শিক্ষক সম্প্রদায়ের হাতে সমাজে উচ্চ আদর্শকে প্রোথিত করার মতো কিছু বৃত্তিগত দায়িত্ব থেকে যায়। যদিও বৃত্তিগত এসকল দায়িত্ব সবটাই শিক্ষকের স্বেচ্ছাকৃত এবং বিবেকের উপর নির্ভর করে।

পরিবর্তনই পরিবেশের ধর্ম। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত থাকে আর্থ – সামাজিক –রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। জগতের অংশ রূপে পরিচালিত শিক্ষাজগতেও সে পরিবর্তনের স্পর্শ এসে লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল মানব সভ্যতার কাছে এক সময় হাতিয়ার। শিক্ষার ধারা বেয়ে এরপর সমাজে এসেছে নবজাগরণ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা । শিক্ষার ইতিহাসের গতিপথের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় সামাজিক কাঠামো অনুসারে শিক্ষক শ্রেণী কখনো দেবতার সাথে সমীকৃত হয়ে সম্মানের আসন লাভ করেছেন, আবার কখনো থেকেছেন অভুক্ত। কখনো বা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য বিদ্রোহের পথে নামতে হয়েছে তো কখনো আবার ভোগবাদী সমাজের লালসার ফাঁদে পা দিয়ে শিক্ষক সম্প্রদায় তার কর্তব্য

পথ থেকে সরেও দাঁড়িয়েছেন । সমাজের দর্পণ সাহিত্যে, সমসাময়িক শিক্ষাপদ্ধতির এসকল চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের সাহিত্য কোনটিই তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা কথাসাহিত্যেও শিক্ষক চরিত্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

কথাসাহিত্য রচনার সময়ে যে প্রধান উপাদানগুলি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয় তা হল প্লট বা আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ ,সময়, ঘটনাস্থল, পরিবেশ ও গল্পের এক সামগ্রিক সুর । এর সঙ্গে যুক্ত হয় জীবন সম্পর্কে কথাকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী।

সমসাময়িক সমাজ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাজগতের স্বরূপ কেমন ছিল এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের অবস্থান কেমন ছিল ? বাংলা কথাসাহিত্যে তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ? সমাজে প্রচলিত এই শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষকসমাজের শিল্পীত রূপ নির্মাণকালে কথাসাহিত্যিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল? বর্তমান অভিসন্দর্ভে এই বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করা হবে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মধ্যে রচিত এই বাংলার সেইসমস্ত কথাসাহিত্যগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে আখ্যান হিসেবে শিক্ষাজগতের কথা আছে এবং প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে শিক্ষক আছেন।

কোরক সাহিত্য পত্রিকা – প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৯ - 'শিক্ষা – শিক্ষণ – শিক্ষকতা' সংখ্যায় প্রাবন্ধিক প্রসূণ ঘোষ 'বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষকতার সেকাল – একাল' প্রবন্ধে শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান লিপিবদ্ধ করেছেন । চন্ডীকাপ্রসাদ ঘোষালের লেখা 'শিক্ষকতার সেকাল' শীর্ষক প্রবন্ধেও শিক্ষকজীবনের অবমাননাকর দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধদ্বয় থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে । এছাড়া জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা' , অনিরুদ্ধ রায় এবং রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি' , ক্ষেত্র গুপ্তের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' , শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্তের '

শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক' , পরমেশ আচার্যের 'বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রধান সহায়ক গ্রন্থরূপে সাহায্য করেছে অভিসন্দর্ভটি রচনাকালে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে ।

সমাজ – রাজনীতি – অর্থনীতির আলোচনা থাকবে এই প্রস্তাবিত গবেষণায়। গবেষণার কাজটি করার জন্য সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনের পাঠ প্রয়োজন । পাঠ্যপুস্তকসমূহের তুলনামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী পাঠ ও পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । ক্ষেত্রসমীক্ষাও করা হবে। উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে গবেষণা কর্মটি নিষ্পন্ন করার জন্য।

প্রথম অধ্যায়

অষ্টাদশ পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

২.১) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যানুসারে শিক্ষা এবং শিক্ষকতার কাহিনী

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার প্রামাণ্য ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় বেদের যুগ থেকেই। আর্য ঋষিদের জীবন এবং জগৎ সম্পর্কিত আধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উত্তর থেকেই জন্ম নেয় বেদ এবং বেদকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা। বৈদিক শিক্ষাদর্শন তৎকালীন যুগের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আর্যঋষি পরিবারেই প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে । এই আর্যঋষিরাই ছিলেন গুরু বা আচার্য। কঠোপনিষদে'র একটি শ্লোকে বলা হয়েছে - যে আচার্য নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করেন না এইরূপ ব্যাক্তি উপদেশ দিলে ব্রহ্মকে নিঃসংশয়ে জানা যায় । 'বায়ুপুরাণ'-এও গুরুর প্রাজ্ঞতাকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় , রাজশক্তির আনুকূল্যে , শিক্ষকের পূর্ণ কর্তৃত্বে সৃষ্ট বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্য সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট ছিল। শূদ্র এবং নারীরা বঞ্চিত ছিল শিক্ষা থেকে। পরবর্তী বৈদিক যুগে যখন ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে এবং কর্ম ভিত্তিক বর্ণব্যবস্থার পরিবর্তে জন্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা গড়ে ওঠে তখন এই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। স্মৃতি-সংহিতার যুগেও এই জন্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা ছিল এবং সেই ব্যবস্থায় অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার অধিকার শুধু ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমায়িত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাধারায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া অন্য যে ধারাটি উল্লেখযোগ্য ছিল সেটি হল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা । হিন্দুধর্মের শিক্ষার মতোই এই শিক্ষাব্যবস্থাও ধর্মকেন্দ্রিক। মুখে মখে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো ত্রিপিটকের মাধ্যমে । হিন্দু ধর্মের শিক্ষাব্যবস্থার জাতিভেদ প্রথা বৌদ্ধ শিক্ষায় ছিলনা , এমনকি জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নানাভাবে চেষ্টাও করেছেন। ভারতীয় শিক্ষাধারার ইতিহাসে গণশিক্ষার প্রবর্তন বৌদ্ধদেরই অবদান । আর এই গণশিক্ষার মাধ্যম যেহেতু ছিল মাতৃভাষা তাই সেসময় আঞ্চলিক ভাষাসমূহের গুরুত্বও বেড়ে যায় । সেদিক থেকে দেখতে গেলে শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রচলন বৌদ্ধশিক্ষারই অবদান । 'তিলমুষ্ঠি জাতক', 'লোশকজাতক' , 'দূত জাতক', শ্বেতকেতু জাতক' প্রভৃতি কাহিনী থেকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে খুটিনাটি নানা তথ্য পাওয়া যায়।

২.২)আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিক্ষাজগৎ ও শিক্ষকসমাজ

মধ্যযুগ নামে চিহ্নিত সময়কালটিতে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল অনুপ্রবেশকারী ইসলাম ধর্মী মুসলিম সুলতানরা। চৈতন্যজীবনীকাব্য , মঙ্গলকাব্য , অনুবাদ সাহিত্য , লৌকিক প্রণয় কাব্য ,নাথসাহিত্য , লোকসাহিত্য ইত্যাদি মধ্যযুগের সাহিত্যগুলি বেশীর

ভাগই মূলত দেবদেবী কেন্দ্রিক ভক্তিমূলক ধর্মীয় রচনা। এসমস্ত কাব্যে কৃষ্ণ , রামচন্দ্র , জনমেজয় , চৈতন্যদেব এবং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলির নায়ক চরিত্রদের শিক্ষা লাভের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে সে যুগের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা গড়ে নেওয়া যায়। মধ্যযুগের কাব্যসমূহে হিন্দু এবং মুসলিম দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। সে সময় ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ শ্রেণীর পঠন ক্রিয়ারও পার্থক্য ছিল ।

অষ্টাদশ শতকের পূর্বের বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জন্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যপন্থী সংস্কৃত শিক্ষাই প্রচলিত ছিল সমাজে এবং ব্রাহ্মণেতর হিন্দুরাও কয়েকটি বিষয় ব্যতিরেকে সেই শিক্ষাই লাভ করতো। মুসলমান সমাজের আগমনে বাঙালী হিন্দু সমাজ পরিচিত হয়েছে মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষার সঙ্গে। হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রাথমিক দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য ছিল দেশীয় পাঠশালা। মুসলমান আমলে ফারসি রাজভাষা হওয়াতে অন্নসংস্থানের জন্য সংস্কৃতের পাশাপাশি শিক্ষার্থীকে ফারসি ভাষা শিক্ষাকে আত্মীকরণও করতে হতো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের গদ্য সাহিত্যে শিক্ষা জগৎ এবং শিক্ষক সমাজ

এ শতকের প্রথমার্ধে এবং প্রায় সমগ্র শতকটি জুড়ে কখনো দেশীয় উদ্যোগে , কখনো মিশনারিদের দ্বারা , কখনো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় , আবার কখনো বা বিদেশী রাজশক্তির সহায়তায় শিক্ষার বিষয়, প্রক্রিয়া , মাধ্যম , কাঠামো সবেতেই পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।

দেশীয়, মিশনারি , ব্রিটিশ এই তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা সমন্বিত উনিশ শতকের বাংলায় প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে এই মতানৈক্যই ছিল এই সময়কালীন শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান একটি বিচার্য প্রসঙ্গ যার মীমাংসা ঘটে বেন্টিঙ্কের সুপারিশে মেকলের মিনিটের (১৮৩৫ খ্রি) মধ্যে দিয়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে অষ্টাদশীয় সর্বজনীন সহজ প্রবেশ্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং উচ্চতর টোল চতুস্পাঠীর শিক্ষাপদ্ধতি উনিশ শতকে ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। ফলত দেশীয় পণ্ডিত , মৌলভীদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষারও বেহাল অবস্থা ছিল। শব্দার্থ মুখস্থ করতে পারাই পরীক্ষা পাসের এবং চাকরির মাপকাঠি হয়ে পড়েছিল।

এমতাবস্থায় সমাজের দর্পণ সাহিত্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষক শ্রেণীর কাহিনী ফুটে উঠেছে তা অধিকাংশই ব্যাঙ্গাত্মক এবং সেখানে উপদেশ দেবার ভঙ্গী বিদ্যমান। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', বঙ্কিমচন্দ্রের 'গ্রাম্যকথা' তার নিদর্শন। এই রচনা ধারার মধ্যে শুধুমাত্র শিক্ষাসংস্কারক বিদ্যাসাগরের 'গুরুভক্তি' নামক রচনাটিতে শিক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের প্রসঙ্গটি উঠে এসছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিক্ষা জগৎ এবং শিক্ষক সমাজ

সমগ্র ভারতবর্ষে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের ন্যায় বিশ শতকের প্রথমার্ধেও ব্রিটিশ সরকার এবং স্বদেশীয় শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দর মধ্যে

বাদানুবাদ চলতেই থাকে। এই সময়পর্বে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক , মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা - এই তিন প্রকারের শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বহু সংস্কার সাধন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সবেরই মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের কর্তৃত্বকে দৃঢ় করা।

১৯০৫ এর পর থেকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি ধারার প্রচলন দেখা যায় । একটি ছিল কার্জনের অধীনস্থ মানোন্নয়নমূলক শিক্ষাসংস্কার এবং অন্যটি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারায় শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা । দেশের বিভিন্ন প্রদেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয় সেখানে আদর্শ শিক্ষক কাকে বলা হবে – একজন শিক্ষকের চরিত্র কেমন হওয়া উচিৎ তা নিয়ে সমকালীন বাংলায় আলোড়ন উঠেছিল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আর একটা বড় দাবি ছিল – মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা। ইংরাজির পরিবর্তে একটি সর্বভারতীয় ভাষা সম্পর্কে গণচেতনা দেখা যায় এসময় । এছাড়াও এই আন্দোলনের অপর উল্লেখযোগ্য যে দাবিটি ছিল তা হল সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি । মহামতি গোখলের নেতৃত্বে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সময় ছিল অত্যন্ত অস্থির এবং সংকটময়। নানা জটিল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ,অসন্তোষ ,আশঙ্কার মধ্য দিয়ে শাসক ও শাসিত উভয় গোষ্ঠীর সময় কাটছিল। বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও সে সময় কম উত্তপ্ত ছিল না । এ সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষার অগ্রগতি সেরূপ ঘটেনি। ৪২ এর ভারতছাড় আন্দোলনে ভারতীয়দের নানা বিপর্যয়ের সন্মুখীনতা , বিশ্বযুদ্ধ শেষে কংগ্রেস , মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশদের মধ্যে চরম বিরোধিতার কারণে গঠনমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ভারতে সবথেকে ক্ষতি হতে শুরু হয়েছিল আর্থিক দিক থেকে। গ্রামীণ অর্থনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছিল। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মূদ্রাস্ফীতি ,বেকারি, মন্বন্তর, কালবাজারি , চোরা কারবার, বোমার আতঙ্ক , বোমা বর্ষণ – এসকল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়া সমাজ কোনক্রমে

এগিয়ে চলছিল। বিশ্বের টালমাটাল অবস্থায় পরাধীন ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অনেকটা এগিয়েও গেছিল । গোটা দেশ জুড়েই ব্যাপৃত ছিল রাজনৈতিক অস্থির পরিবেশ। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষার অবস্থাও ছিল তথৈবচ।

এই কাল পর্বে শিক্ষকদের চাকরির অবস্থা ছিল শোচনীয়, বেতনও আকর্ষণীয় ছিল না । পেশাগত স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা, আয়ের সুরাহার অভাবের কারণে কোন যোগ্য ব্যক্তি জীবনধারণের উপায় রূপে এই বৃত্তির দিকে অগ্রসর হতে চায়নি। বেসরকারি স্কুলের অবস্থাও ছিল অনুরূপ , কখনো আবার এর থেকেও শোচনীয়।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধের দ্রুত পরিবর্তিত এই আর্থ – সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভাবিত করেছে এই সময় পর্বের কথাসাহিত্যিকদের । তাঁরা তাঁদের কাহিনীর শিক্ষক চরিত্র সৃষ্টিতে যে বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা হল নিম্নরূপঃ

১) আদর্শ শিক্ষকের স্বরূপ নির্মাণ এবং উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির চিত্র নির্মাণ। উদাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মাস্টারমশায়’ , শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পণ্ডিতমশাই’।

১) দেশজ প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার স্থলে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন। উদাঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ সন্দীপন পাঠশালা’।

২) বেকারত্ব থেকে বাঁচতে , স্কুলের চাকরী বাঁচাতে শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্থসম্পন্ন স্কুল পরিচালন সমিতির আনুগত্য পাবার অভ্যেস তৈরী করে শিক্ষক শ্রেণী। উদাঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অনুবর্তন’।

৩) যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্ল্যাকআউটের কলকাতা শহর , বোমা পড়ার ভয়ে নিঃসহায় শিক্ষকদের শহর ছেড়ে প্রায় নিঃস্ব হাতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে গ্রামের দিকে পাড়ি দেওয়া। অনির্দিষ্টকালীন পঠন ক্রিয়া বন্ধ। উদাঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অনুবর্তন’।

৪) যুদ্ধবিদ্ধস্ত কালোবাজারে সন্তানসন্ততি, সংসার বাঁচাতে দরিদ্র শিক্ষকের আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে পড়ার অসহায়তা। উদাঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অনুবর্তন’।

৫) ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতিবাদ। উদাঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘টিচার’।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধের দ্রুত পরিবর্তিত আর্থ – সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশে অবক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটেছে। সেই অবক্ষয়িত সমাজে নৈতিকতার আদর্শ শুধুমাত্র শিক্ষক সমাজের দায় বলে দেগে দেওয়া হয়েছে এবং তার যাঁতাকলে পিষ্ট দরিদ্র শিক্ষকেরা যুদ্ধবিদ্ধস্ত কালোবাজারে সন্তানসন্ততি, সংসার বাঁচাতে আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়েছে। এই সময় রাজনৈতিক সুবিধাভোগী ধনীশ্রেনী, রায়বাহাদুর , শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্থসম্পন্ন ব্যাবসায়ী প্রমুখেরা স্কুল পরিচালনা সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ‘পেটের দায়ে’ শিক্ষকতা বৃত্তি নেওয়া শিক্ষকগণ স্কুলের চাকরি বাঁচাতে বাধ্য হয়ে এই শ্রেণীর আনুগত্য পাবার অভ্যেস তৈরী করেছে।

৪র্থ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষা জগৎ এবং শিক্ষক সমাজ

এই শতকের মধ্যভাগে ভারতবাসীর কাছে কাঙ্খিত স্বাধীনতা এসেছে তবে তা এসেছে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। দেশভাগের যন্ত্রনা তখন সকলের মনের আশাকেই ভঙ্গ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল স্বাধীন ভারতে নতুন করে বাঁচার। অথচ বাস্তবে তা ঘটেনি। এই শতকের ষাট, সত্তরের দশকে বাংলায় ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু ঘটনা – খাদ্য

আন্দোলন , কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন, নকশাল আন্দোলন , ৭২'য় উদ্বাস্তু সমস্যা , ৭৬' য় জরুরী অবস্থা বাঙলার মানুষকে আশাহত করেছে বারংবার।

এদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল কোন পরিবর্তন আনেননি বরং পূর্ববর্তী শিক্ষানীতিকেই কিছুটা সম্প্রসারিত করেছিলেন মাত্র। শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশার উন্নয়ন ঘটানোর দাবিতে , শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ১৯৫৪ সালে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষক সম্প্রদায় আন্দোলন শুরু করেন।

সমাজ সচেতন লেখকগণ এইসকল ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাজে যে আলোড়ন তুলেছিল তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন কাহিনী বয়নের মধ্য দিয়ে।

এই পর্বে শিক্ষকদের নিয়ে রচিত হয়েছে 'রাত্রির তপস্যা' , 'মানুষ গড়ার কারিগর' ,

'নির্জন শিখর','চতুষ্পাঠী','উত্তরসাধক', 'পাদটিকা', 'বৈয়াকরণ' ,'হেডমাস্টার' প্রভৃতি রচনাগুলি।

এগুলিকে বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষকের চরিত্র বিনির্মাণে কথাসাহিত্যিকগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অবলম্বন করেছেনঃ

১) স্বাধীনতা পূর্ববর্তী শিক্ষকদের যে অনটনের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করতে হয়েছে সে অবস্থার কোন পরিবর্তন স্বাধীনতা লাভের পরেও হয়নি।

২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বর্তী সংকীর্ণ রাজনীতি , যেখানে একজন শিক্ষক তাঁরই সহকর্মীর নামে গোপনে কর্তৃপক্ষের নিকটে নালিশ করেন। একে অন্যের সমালোচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। এ প্রবণতা এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'অনুবর্তন' নামক উপন্যাসেই দেখা গেছিল। যদিও সেখানে অত্যন্ত দরিদ্রতা তাঁদের সহমর্মী করেছিল পরস্পরের । কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সেটুকু

সহমর্মিতাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল। উদা- মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ' নির্জন শিখর'।

৩) কর্তব্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ন শিক্ষকের প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কাজের সদিচ্ছা থাকলেও পারিপার্শ্বিক চাপের কাছে নতি স্বীকার। উদা- মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর'।

এই পর্বের প্রথম দিকের কথাসাহিত্যে স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা , খাদ্যসঙ্কটের পরিস্থিতিতে অসহায় শিক্ষকদের দুর্গতিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিদ্যার প্রতি অনুরাগী নিয়মনিষ্ঠ ছিন্নমূল শিক্ষকের বিদ্যাকে আঁকড়ে বাঁচার তীব্র আকুতিকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন কথা সাহিত্যিকগণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার' গল্পের হেডমাস্টার, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসের অনঙ্গমোহনের তার উদাহরণ। এই শতকের শেষের দিকে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যাবসায় পর্যবসিত হয়েছে। নূন্যতম কমিশনের আশায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যবিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে প্রকাশক সংস্থা এবং শিক্ষকগণের কদর্যতা, চাকরী পাবার আশায় নাম্বার ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্র – শিক্ষকের পরীক্ষা পাশ করা এবং পাশ করানোর খেলায় মেতে ওঠার প্রসঙ্গগুলি উঠে এসেছে কথাসাহিত্যে।

৬

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে নারীশিক্ষা জগৎ এবং শিক্ষিকা সমাজ

বৈদিক সাহিত্যের নিদর্শন অনুয়ায়ী বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে সমাজের তিন উচ্চ বর্ণের নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন এবং তাঁরা অধ্যাপনাও করতেন। ধর্মসূত্র এবং মনুসংহিতার যুগ

থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক কারণে নারীসমাজের অবমাননার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। ফলে নারীশিক্ষাও ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সমাজে নারীর এই অবস্থান অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন কোন অভিভাবকের সহায়তায় সমাজে নারীশিক্ষা ফল্গুধারার মতো বহমান ছিল এবং সেসকল নারীরাও পণ্ডিত ছিলেন। লালা রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী দেবী, বৈজয়ন্তী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, হটু বিদ্যালঙ্কার , হটি বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। হটি বিদ্যালঙ্কার বারানসীতে অধ্যাপনাও করতেন। বৈষ্ণব তথা মা গোঁসাইরাও শিক্ষিত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা বৈষ্ণব সমাজে 'আচার্যা'র পদ গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি ইংরেজ গভর্নেস ও শিক্ষয়িত্রী আসার আগে ভদ্রঘরের বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব বৈষ্ণবীরাই পালন করেছেন। উনিশ শতকে নবজাগরণের প্রভাবে নানা প্রকার সামাজিক বাধা সত্ত্বেও নারীশিক্ষায় নতুন করে প্রগতি শুরু হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষিকা এসেছেন পার্শ্বচরিত্র হিসেবে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিয়ে এলেন 'হেডমিস্ট্রেস' গল্পটি যার প্রধান চরিত্র একজন শিক্ষিকা।

কথাসাহিত্যে শিক্ষক চরিত্রের তুলনায় শিক্ষিকার চরিত্র বড়ই অপ্রতুল। কথাসাহিত্যিকগণ শিক্ষিকা শ্রেণীর যে শিল্পীত রূপ অঙ্কন করেছেন সেখানে শিক্ষিকাগনের প্রতিবাদী সত্তার পাশাপাশি তাঁদের সৃজণশীল গুণটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা'র কল্যাণী , 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য , নরেনন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমিস্ট্রেসে'র সুপ্রীতি, নারায়ণ সান্যালের 'রূপমঞ্জরী'র হটি বিদ্যালঙ্কার , বানী বসুর 'উত্তরসাধকে'র মেধা ভাটনগর এই একই ধারার পথ প্রদর্শক।

সমাজে বিকৃতমনস্ক মনোবৃত্তি, রাজনৈতিক অভিসন্ধি ,আর্থিক অনটন ,ক্ষমতার দম্ভ শিক্ষককে, শিক্ষাজগৎকে প্রভাবিত করলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মেলবন্ধন যে সেসমস্ত অসঙ্গতিকে দূরীভূত

করে দিয়ে সুস্থ সুগঠিত সমাজ নির্মানের প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে, শিক্ষিকা কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে সেই প্রসঙ্গটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

৭

সিদ্ধান্ত

ভারতবর্ষের মতো উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশে বৈদেশিক আগমন ঘটেছে বারে বারে যার ফলে দেশের অন্তর্বর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটেছে। বলা বাহুল্য, সমাজ সম্পৃক্ত শিক্ষাব্যবস্থাও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটা ধারা থেকে আরেকটা ধারায় বাঁক নিয়েছে। বৈদেশিকদের মধ্যে যারা বিজয় স্থাপন করেছে তাদের আধিপত্যের প্রভাবে সমকালীন সমাজ , সভ্যতা , সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। দেশের মধ্যে বিরাজিত শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশ থেকে আগত শিক্ষা সংস্কৃতির সংমিশ্রণে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে সমাজে । শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রমাণ স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অবশ্য স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও দেশীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারের মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজে প্রচলিত শিক্ষাপ্রক্রিয়া , শিক্ষকতা বৃত্তির দোষ-গুণ উভয় বৈশিষ্ট্যই স্থান করে নিয়েছে কথাসাহিত্যে। আলোচ্য গবেষণা থেকে এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে আসা যায় শিক্ষাব্যবস্থা একটা মিলিত সামাজিক প্রয়াস। উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা আবশ্যক। সেইসঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ। শিক্ষকতা বৃত্তিটির নিশ্চয়তাও থাকতে হবে। মানবিকবোধ সম্পন্ন উদার ধৈর্যশীল মুক্তমনা শিক্ষককেও জ্ঞানচর্চার অভিলাষী হতে হবে। আর শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ শিক্ষার্থীকেও বিদ্যাভিলাষী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, উৎসাহী – প্রাণবন্ত শিক্ষার্থীর সংস্পর্শ শিক্ষক সমাজকে সজীব করে তুলতে সক্ষম। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মিলিত প্রয়াসই সৃজন করতে পারে উন্নত

মানের সমাজ। তাই বলা যেতে পারে ক্রম বিবর্তনের পথে শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষক- শিক্ষার্থীর সম্পর্ককেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কথাসাহিত্যে।